এই দিন সেই দিন (৫)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভূমধ্য সাগর, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিন আফ্রিকার উপকুলভাগ বিধৌত করায়, সাগরবক্ষ হতে উল্লিখিত দুই মহাদেশের উপকুলবর্তি জনপদসমুহের ওপর আক্রমন করার সপ্ন হজরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) রাত দিন তাড়া করতো। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব মেডিটারেনিয়ান এলাকায় অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপটি দখলের অভিপ্রায় তাঁর বহুদিনের। হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ে মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস, পাকিস্তান (তখনকার সময়ের ভারতবর্ষ) ও ভারতের কিছু সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তাঁর সেনাপতি আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) পরামর্শে মুয়াবিয়ার (রাঃ) প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। খলিফা উসমানের (রাঃ) কাছে মুয়াবিয়া (রাঃ) আবার সাইপ্রাস দ্বীপ দখলের প্রস্তাব পাঠালেন। জলযুদ্ধে মুসলিমদের অদক্ষতার কথা স্মরণ করে খলিফা সংকিত হলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার (রাঃ) সাইপ্রাস দখলের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। যুদ্ধের অনুমতি দিলেন সত্য, তবে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। উসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন, বিগত অনেক যুদ্ধে বিভিন্ন এলাকার অমুসলিম, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কিছুকিছু লোক শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহন করে। তাঁর বিশ্বাস এরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে একদিন ইসলামের খলিফার বিরোদ্ধাচরণ করবে। খলিফার এই বিশ্বাস মোঠেই অমূলক ছিলনা। ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছিল যে, যুদ্ধই জিবীকা নির্বাহের একমাত্র উপায়।

অনুমতি পেয়ে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সারা দেশে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সৈনিক আহ্বান করলেন। জলযুদ্ধের ট্রেইনিং শুরু হলো। রাজধানীতে মানুষের দলেদলে সৈনিকের খাতায় নাম লিখানোর তোড়জোড় পড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে উঠলো। আব্দুল্লাহ্ বিন- কায়েস আল্ হারেসীর নেতৃত্বে, আল্লাহ্র নাম নিয়ে, হিজরী আটাইশ সনে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস উপকুলে এসে পৌছে। গ্রীক নৌ-বাহিনীর সাথে পরদিন শুরু হলো ভয়ানক যুদ্ধ। প্রথম দিনের যুদ্ধেই মুসলিম সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ বিন- কায়েস (রাঃ) তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হলেন। খবর পেয়ে মদীনায় খলিফা চিন্তিত হলেন। তাড়াতাড়ি মিশরের গভর্ণর আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে (রাঃ) সাইপ্রাস অভিমুখে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন। মিশর থেকে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ সৈন্য নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত মুলিম বাহিনী আত্মরক্ষামুলক যুদ্ধ চালিয়ে গেল। অল্পদিন পরে মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলিত নৌ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমনে গ্রীক বাহিনী পরাজয় বরণ করে। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস অধিবাসীগণের ওপর জিজিয়া কর ধার্য না করে রাষ্ট্রের ওপর বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ট্যাক্স আরোপ করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেন। মুয়াবিয়ার পরামর্শে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ নৌ-বহর বোঝাই করে যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ বিন- কায়েস (রাঃ) অন্য একটি যুদ্ধে মারা যান। জীবিত কালে তিনি কমপক্ষে ৫০টি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন।

আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ যখন সাইপ্রাস উপকুলে জল-যুদ্ধে ব্যস্ত, হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখন স্থল-যুদ্ধে কনষ্টানটাইন দখল করতে বেবিয়ে পড়েন। কনষ্টানটাইন দখল করতে মুয়াবিয়া (রাঃ) দুইবার চেষ্টা করে ও ব্যর্থ হন। কিন্তু ঐ বৎসরই তিনি আর্জরুম প্রদেশের অন্তর্গত হাস আল্-মুরাত নামক এলাকটি দখল করতে সক্ষম হন।

কুফার নব-নিযুক্ত শাসন কর্তা অলিদ ছিলেন নবীজী মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণের শত্রু ওকবার পুত্র। নবীজীর সাথে ওকবার একটি ঘঠনা কুফাবাসীর জানা ছিল। এক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের হাতে ওকবা বন্দী হয়ে ঘৃনা ও তাচ্ছিল্য ভরা সুরে নবীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি (ওকবা) মারা গেলে তাঁর সন্তানগণ কি খাবে? উত্তরে নবীজী বলেছিলেন- *দোজখের আগুন খাবে।* সেই ওকবার ছেলে অলিদকে, অসৎ চরিত্রের লোক হিসেবে মানুষ আগে থেকেই জানতো। ক্রোধে, ঘৃণায় কুফাবাসী বারবার খলিফার কাছে অভিযোগ করে ও কোন ফল পেলোনা। অলিদের কঠোর দমন নীতির সামনে সাধারণ মানুষ মাথানত করতে বাধ্য হলো। অন্যায়, অত্যাচার আর সেচ্ছাচারিতার চুড়ান্ত সীমায় এসে অলিদ একদিন জনতার ফাঁদে ধরা পড়ে যান। মদ্যপানে অভ্যস্থ, হজরত অলিদ নেশা-গ্রস্থ হয়ে একদিন এমন ভাবে ঘুমিয়েছিলেন যে, কিছু লোক তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে রাষ্ট্রীয় সীলযুক্ত একটি আংটি খুলে, অসংযত চরিত্রের প্রমান স্বরূপ, মদীনায় খলিফার কাছে নিয়ে যায়। তা ছাড়া তিনি একদিন নেশায় বিভোর হয়ে মসজিদে ইমামতির সময়ে ফজরের নামাজ, ফরজ দুই রাকাতের যায়গায় চার রাকাত পড়ায়েছেন বলে ও তারা খলিফার কাছে অভিযোগ করে। এ নিয়ে সারা দেশে বিক্ষোভ ঠেকাতে খলিফা বাধ্য হয়ে অলিদকে পদচ্যুত করেন। এর পর থেকে অলিদ আর কোনদিন হজরত উসমানকে (রাঃ) সুনজরে দেখেননি। এবার খলিফা কুফার মসনদে বসালেন বসোরার সেনাপতি, কোরায়েশ বংশের তরুণ বীর যোদ্ধা সাইদ বিন আল্ আ'সকে। এই ব্যক্তির ভেতর কোরায়েশ সুলভ অমানবিক, দুষ্চরিত্রের অভাব মোঠেই ছিলনা। কোরায়েশদের ঔদ্ধত্য, অহমিকা কুফাবাসীর জানা ছিল। আগের সকল শাসকের চেয়ে নতুন গভর্ণর ভয়ানক রূপে প্রকাশ হলেন। তিনি স্থানীয় অমুসলিমতো দূরের কথা, অ-কোরায়েশ মুসলিমদেরকে ও হীন মর্যাদার, পশু পকৃতির বলে খলিফাকে পত্র দ্বারা অবহিত করলেন এবং বল্লেন, এদেরকে তিনি লৌহ-দন্ড দিয়ে শায়েস্তা করবেন। তিনি প্রকাশ্য ঘোষনা দিলেন, একমাত্র কোরায়েশ বংশই সম্ভ্রান্ত, শালীন ও উচ্চমর্যাদার দাবী করতে পারে। একটি বৈঠকে সাইদ যখন বল্লেন- সোয়াদ উপত্যকাটি একচেটিয়া কোরায়েশ বংশের লোকদের জন্য রক্ষিত, উপস্থিত জনগণ সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো। তারা বল্লো- এই বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে কুফা ও বসোরাবাসীর অবদান ভুলে গেলে কোরায়েশদের ভালো হবেনা। সারা দেশ জুড়ে গণ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। এই বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উসমান (রাঃ) কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। ইত্যবসরে বসোরার একটু খোঁজ নেয়া যাক।

রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কুফার পরেই বসোরার স্থান। কুফা ইরাকের উত্তরাঞ্চলের ও বসোরা দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল । বসোরার শাসনকর্তা এখান থেকে দক্ষিন পারস্য, বেলুচিস্থান ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত শাসন চালাতেন।

কুয়েতের দক্ষিনাঞ্চল ও বসোরার শাসনাধীন ছিল। হিজরী ২৪ সনে হজরত ওমর (রাঃ) সাহাবী হজরত আবু মুসা-আশআরীকে (রাঃ) বসোরার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। একনাগাড়ে বহুদিন অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আবু মুসা-আশআরী (রাঃ) হয়ে উঠেন এক ভয়ানক আত্মম্ভরী স্বৈর-শাসক। একটি এলাকা দখলের প্রস্তুতিকল্পে আবু মুসা-আশআরী (রাঃ) মসজিদে জিহাদের ফজিলত বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে, পায়ে হেঁটে জিহাদের ময়দানে গেলে প্রচুর সোয়াব অর্জন করা যায়। লোকে বল্লো- তাঁর কথায় মিথ্যাচার আর হঠকারিতা আছে। পরদিন ভোর বেলা অবাক বিস্ময়ে সাধারণ জেহাদীগন প্রত্যক্ষ করলো, গভর্ণর আবু মুসা-আশআরী (রাঃ) রাজকীয় পোষাকে তাজী ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। চল্লিশটি গাধা তাঁর যুদ্ধ-সরঞ্জাম বহন করছে। কিছু লোক তাঁর পথ রুখে দাঁড়ালো। আবু মুসা ঐ লোকদিগকে নীচ, হীনমনা, বদজাত বলে ধমকালেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিলেন। পূর্বে তাঁর অসীম ক্ষমতার অহমিকা ও সেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে জনগন বিদ্রোহ করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আবু মুসা (রাঃ) তাঁর আত্মীয়জনদেরকে অত্যধিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্রকে, সুবিধা প্রাপ্ত ও সুবিধা বঞ্চিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেন। সুবিধা-বঞ্চিতদল সংগঠিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মদীনা পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। একটি নিশ্চিত গৃহ-যুদ্ধের লক্ষণ টের পেয়ে খলিফা উসমান (রাঃ) হিজরী ২৯ সনে, আবু মুসা-আশআরীকে (রাঃ) গভর্ণরপদ থেকে বরখাস্ত করেন। গৃহ-যুদ্ধ ঠেকানো গেল কিন্তু বসোরা বাসীর দুঃখ দূর হলোনা। এবারে বসোরার ক্ষমতায় বসলেন, খলিফা উসমানের (রাঃ) মামাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমীর। এই লোকটি খালিদ বিন ওলিদ ও আমর ইবনুল আ'সের চেয়ে ও ভয়ংকর দুর্ধর্ষ ছিলেন। ক্ষমতায় বসেই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অ-কোরায়েশদের অধিকার নিষিদ্ধ করে দেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমীর ভীষন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর অমানবিক কঠোর শাসন-নীতি মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিম জগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কোরায়েশ বনাম অ-কোরায়েশ। একদিকে যেমন খলিফা উসমানের (রাঃ) রাজ্য বিস্তার, বিভিন্ন দেশ, এলাকা দখল ও দখলকৃত এলাকায় বিদ্রোহ দমনকার্য চলতে থাকলো, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে, উসমানের (রাঃ) ক্ষমতাসীন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের (দঃ) হাশিমী বংশ, আরবদের বিরুদ্ধে অনারব, কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অ-কোরায়েশ, শোসকের বিরুদ্ধে শোসিতের বেঁচে থাকার সংগ্রাম অব্যাহত থাকলো।

হজরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক এতদ্বযাবত মিশর, কুফা ও বসোরার ক্ষমতাচ্যুত কলুষ-চরিত্রের ও অসুর প্রকৃতির শাসকগণ যখন দলবদ্ধ হয়ে খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন, উসমান (রাঃ) তখন বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতায় আরো কিছুদিন টিকে থাকার লক্ষ্যে, কোরআন সংকলনের উদ্যোগ নিয়ে বলতে গেলে বিষাক্ত কাল-নাগের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দেন। সেই ওমরের (রাঃ) খুনী পুত্রের বিচার থেকে আজ পর্যন্ত প্রজাগণ উসমানের (রাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনের আইন শারীয়া অনুসরণের উদাহরণ দেখেনি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষ খলিফার কোরআন সংকলনের উদ্যোগে সন্দিহান না হয়ে পারলোনা। হজরত উসমান (রাঃ তাঁর দুধ ভাই, মিশরের অধিপতি, আল্লাহ্র বাণী কোরআনে অবিশ্বাসী, আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহকে (রাঃ) কোরআন সংকলন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলেন না।

চলবে-